অরবিন্দ ঘোষের বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- *The Life Divine, Hymns to the Mystic Fire, The Synthesis of Yoga, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity* এবং *Savitri*.

নেতিদ্বয়, সচ্চিদানন্দ : শুদ্ধসত্তা, চিৎশক্তি ও আনন্দ

যে পূর্বস্বীকৃতিগুলিকে ভিত্তি করে অরবিন্দের দর্শনচিন্তা গড়ে উঠেছে তাদের অন্যতম হল এই যে – জড় এবং চেতন উভয়ই সৎ। যে অধ্যাত্মবাদী দর্শন জড়কে অস্বীকার করে এবং যে জড়বাদী দর্শন চৈতন্যকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করে না, সেই দুটিই একদেশদর্শী।[২] অরবিন্দের দৃষ্টিতে, জড় থেকে চেতনকে পৃথক্ করার অর্থ জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদ-এই দুটির মধ্যে কোন একটিকে সঠিক বলে নির্বাচন করা এবং এই নির্বাচনের ফল বিপজ্জনক। মানুষের চিন্তার ইতিহাস এই দুটির কোন একটিকে নির্বাচনের ইতিহাস। মানুষ হয় চৈতন্যকে কল্পনার

ভ্রম বলে অথবা জড়কে ইন্দ্রিয়ের ভ্রম বলে অস্বীকার করেছে। ফলে হয় জড়নির্ভর পার্থিবজীবন অথবা চেতননির্ভর অধ্যাত্মজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

যথার্থ দর্শনচিন্তা, অরবিন্দের মতে, এই দুটি নেতিবাদের কোনটিকেই স্বীকার করবে না। জড়বাদ চিৎসত্তাকে অস্বীকার করে শুধু জড়কে তত্ত্ব বলে মান্য করে। কিন্তু এধরনের পর্যবসানবাদের অসুবিধে এই যে, 'শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান হতে পারে'—এইমাত্র স্বীকার করলে অতীন্দ্রিয় অথচ অজ্ঞেয় নয় এমন বস্তুর জ্ঞান অস্বীকার করতে হয়, আর দ্বিতীয়ত, জ্ঞানোৎপত্তিতে মনের গঠনমূলক ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা হয়। এছাড়া, 'জড়ই একমাত্র সৎ'-এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জড়বাদীকেও স্বীকার করতে হয় যে "তার কল্পিত অদ্বয়তত্ত্বও প্রত্যক্ষের অগোচর, অকর্তা পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই দৃশ্যজগৎ হতে বিবিক্ত উদাসীন।"[৩] অর্থাৎ জড়বাদে শুধু "চিন্তাশক্তির দীনতা" প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টি থেকে যে বস্তুজগতের খণ্ডন, তাকে অরবিন্দ বলেছেন, "The Refusal of the Ascetic" বা "বৈরাগীর নেতি"। অরবিন্দের মতে এই প্রতিষেধ জড়বাদীর অধ্যাত্ম জগতের প্রতিষেধের চেয়েও সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত এবং ব্যক্তির ও জাতির উপর তার প্রভাব আরও ক্ষতিকর। জড়বাদের মধ্যে যে যুক্তিপ্রবণতা আছে তা মানুষের বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও শাণিত করে। অপরিশীলিত বুদ্ধি নিয়ে অধ্যাত্মচিন্তা করলে সত্যের চারপাশে কুসংস্কার জড়ো হয় এবং সত্যের অন্বেষণ ব্যাহত হয় বলে অরবিন্দ মনে করেন। আর যেক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদী যুক্তির সাহায্য নেন, সেক্ষেত্রেও বেদান্তীর মত তিনি প্রাতিভাসিক জীবনকে অবাস্তব মায়া বলেন। সুতরাং ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—বেদান্তের এই মহাবাক্যকে মেনেছে। কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই আরেকটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়কে মর্যাদা দেয়নি। ফলত, বন্ধন এবং মুক্তি দুটি বিরুদ্ধ কোটিতে পর্যবসিত হয়েছে। ভবপ্রত্যয়ে বন্ধন এবং ভবনিরোধে মুক্তি। এই মায়াবাদ যে ভারতীয় ভাবধারার সর্বস্ব তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই মতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তার ফলে ভারতবর্ষ অধ্যাত্মসম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়েছে সত্য, কিন্তু জড়বাদের মধ্যে যা শ্রেয়, তাকে বর্জন করায় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

এই দুটি নেতিবাদের কোনটিই অরবিন্দের দর্শনে গৃহীত হয়নি—এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে এই দুটি মতবাদকে তিনি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। বরং অরবিন্দের স্পষ্ট বক্তব্য হল, শুধু " সর্বসমন্বয়ী বোধির দীপ্তির" দ্বারাই একটি ইতিবাচক দর্শনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব। অধ্যাত্মবাদী শুদ্ধচৈতন্যকে জগতের কারণ বলেন— এই চৈতন্যের উপলব্ধিই জীবের উত্তরণ। আবার জড়বাদ মতে জড় জগৎসৃষ্টির কারণ— কেবল অনাত্মা সৎ। এই দুটি দাবীর কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না এবং "... সত্যের এমন-একটা পরিপূর্ণ রূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়,...।" অরবিন্দের মতে, কোনো *এক* সর্বগত পরমার্থ সৎ স্বীকার করলে এই বিরোধের সমাধান সম্ভব। কারণ সেক্ষেত্রে সত্তা-অসত্তা, সত্য-অনৃত, ব্রহ্ম-অব্রহ্ম, আত্মা-অনাত্মা, বস্তু-অবস্তু সবই তার অন্তর্গত হয়ে যায়।[৫]

সব একত্ববাদী দর্শনতন্ত্রকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তা হল এই যে, এক কীভাবে বহুর কারণ হয়, আর বহু একের কার্য হয়েও কীভাবে তার বহুত্ব বজায় রাখে? দিব্য-জীবন গ্রন্থে অরবিন্দ বিশদভাবে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর আলোচনা করেছেন। পরমার্থ সৎ তাঁর দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অথবা, সত্তা-চিৎশক্তি-আনন্দ স্বরূপ। অখণ্ড, অদ্বয় ব্রহ্ম যে শুদ্ধসত্তারূপে মূল সত্য বা সমস্ত প্রতিভাসের অধিষ্ঠানরূপ তত্ত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গতি, শক্তি এবং পরিণতিও সমান সত্য। অতএব জগতের প্রতিভাসের মূলে পাওয়া যায় দুটি তত্ত্ব—একটি শুদ্ধ সত্তা (pure existence) এবং আরেকটি জগৎ-সত্তা (world-existence), অর্থাৎ, সত্তা বা সন্মাত্র (Being) এবং সম্ভূতি (Becoming)। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, বস্তুতঃ পরমার্থসত্য সন্মাত্রও নয়, সম্ভূতিও নয়, একও নয়, অনেকও নয়। স্থিতি এবং গতি, একত্ব এবং বহুত্ব "অকল্পনীয় নির্বিশেষের কল্প পরিচয় শুধু।" অর্থাৎ প্রতিভাস মাত্র। জগদ্-ভাবকে সেইজন্য অরবিন্দ তুলনা করেছেন শিবের নৃত্যের সঙ্গে। এই দেবতার প্রতিটি পদক্ষেপণে যেন তাঁর অসংখ্য প্রতিরূপ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয় যদিও তাঁর সত্তা অম্লান, অচঞ্চল, কালত্রয়ে নির্বিকল্প, নির্বিকার থাকে। তবে যেহেতু স্থিতি এবং গতি, একত্ব ও বহুত্বের অতীত কোন পরমার্থসত্যের কল্পনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাই নির্বিশেষের এই দ্বৈতভাব স্বীকারে কোন বাধা নেই।

এখন প্রশ্ন হবে, জগদ্‌ভাবের কারণ যে স্পন্দন বা শক্তি, তার স্বরূপ কী? এই শক্তি চেতন না অচেতন? অরবিন্দ দেখিয়েছেন যে এই শক্তিকে চেতন বলেই স্বীকার করতে হবে কারণ সাংখ্যদার্শনিকের মতো ব্যক্তজগতের মূল কারণ প্রকৃতিকে অচেতন বললে অথবা পাশ্চাত্য জড়বাদীর মতো জড়কে চৈতন্যের কারণ বললে জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা অনর্থক জটিল হয়ে পড়ে। অবশ্য এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, শক্তিকে চেতন বললে অনুভববিরোধ হয়। এই আপত্তির উত্তরে অরবিন্দ বলেছেন, মানুষ সাধারণতঃ মনে করে যে চৈতন্য এবং জাগ্রদবস্থা সমার্থক। একারণেই প্রকৃতিকে চেতন বলতে তার দ্বিধা হয়। কিন্তু চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অরবিন্দের মতে, "...দার্শনিক বিচারে এখন থেকে এ-দৃষ্টিকে পুরোপুরি বর্জন করে চলতে হবে।" প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা যে বলেছিলেন, যাকে জাগ্রৎদশাতে আমরা জানি চৈতন্য বলে, তা সমগ্র চেতন-সত্তার অল্পাংশমাত্র - তা মিথ্যা নয়। জাগ্রৎ চেতনার পেছনে আছে অধিচেতনা (subliminal consciousness) বা অবচেতনার (subconscient consciousness) বৃহত্তর ক্ষেত্র। এই অধিচেতনার এবং অবচেতনার গভীরতা ও ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎকালীন চেতনার বহুগুণ বেশি।[৬]

শক্তি যদি চিৎ-শক্তি (Conciousness force) হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন হবে, শুদ্ধসত্তা—যা পরমার্থ সৎ, তার সঙ্গে এই চিৎ-শক্তির সম্বন্ধ কী? যদি চিৎ-শক্তিকে সত্তার স্বভাব বলা হয়, তাহলে শুদ্ধসত্তাও শুধু সত্তারূপে থাকবে না, তার ক্রিয়া থাকা আবশ্যক হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সত্তার স্বরূপ শক্তিতে পর্যবসিত হবে, ফলে শুদ্ধসত্তার স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হবে। অরবিন্দ বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের অনুসরণ করে, শক্তিকে সত্তার অন্তর্ভাবী (inherent) বললে এই অসুবিধে হয় না। অর্থাৎ শুদ্ধ সত্তা এবং শক্তির স্বরূপ এক নয়, কিন্তু এই শক্তি সর্বব্যাপী শুদ্ধ সত্তার বহির্ভাবীও নয়। এই দুটিকে পৃথক্ করা যায় না। এখন দেখা যায়, সত্তার অন্তর্গত এই শক্তি কখনও স্পন্দিত বা সক্রিয়, কখন নিঃস্পন্দ বা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যখন শক্তি নিষ্ক্রিয়, তখনও সত্তা থেকে তার বিচ্যুতি হয় না বা কোন তাত্ত্বিক বিকারও হয় না। কারণ শক্তির দুয়েরই যোগ্যতা (potentiality) আছে। শক্তির স্পন্দন (movement)-কে তার আত্মবিচ্ছুরণ (self-diffusion) এবং নিঃস্পন্দন (rest)-কে তার আত্ম-সংহরণ (self-concentration) বলা যেতে পারে।